সপ্তম অধ্যায়

প্রবাদ : অতীত ও বর্তমান

মানুষের ভাব প্রকাশের এক বিশিষ্ট মাধ্যম প্রবাদ। এই প্রবাদ, ছন্দ-অলঙ্কারের মিশ্রণে ভাষাকে মধুর করে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। গ্রামে-গঞ্জে, পথে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা দৈনন্দিন কর্মজীবনে বা অবসর যাপনে হাসি-কান্না, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগের মাধ্যমে সাহিত্য বা সাহিত্য বর্হিভূত প্রবাদগুলি প্রত্যহ বলে থাকে। ফলে নিত্য নৈমিত্তিক বাংলা আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডারের শূণ্যতা পূরণ করে চলেছে। শব্দভাণ্ডারকে সজীব-সক্রিয়তা রাখতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে ভাষা পরিবর্তনশীল হলেও প্রবাদে উল্লেখিত গ্রামের নিজস্ব শব্দগুলি অবলুপ্ত হয় না। প্রবাদের উচ্চারণ ভঙ্গি (ছন্দ সুর সহযোগে) এবং নিজস্ব শব্দের কখনো মৃত্যু ঘটে না। একমাত্র প্রবাদই ঐতিহ্যপূর্ণ বাংলা শব্দগুলি বর্তমান কাল অবধি টিকিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে অতীতকালে যেমন প্রবাদ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি বর্তমান কালেও প্রবাদের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রবাদ শুধু লোকশিক্ষার আধার নয়, মানুষের জীবনের ভাল-মন্দের দিক নির্দেশ করে, সতর্ক বার্তা প্রেরণ করে, স্বাস্থ্য সচেতনতার দিক নির্দেশ করে। পরিবার থেকে দৈনন্দিন জীবনের আদেশ-উপদেশ-আদর্শ পেয়ে থাকি। সমাজ কল্যাণের নানান দিক প্রবাদের মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি। প্রবাদ যেমন আঞ্চলিক ভাষা, নিজস্ব শব্দভাণ্ডারকে রক্ষা করে তেমনি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ-সাংস্কৃতিক দিকটিকেও উদ্‌ঘাটন করে এবং তাকে আগলে রাখে। অর্থাৎ প্রবাদের মধ্যদিয়ে আঞ্চলিক ভাষা ও সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।

বাঁকুড়া জেলার প্রবাদ এক বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে বাঁকুড়া জেলার ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু প্রবাদ লেখকের কলম ধরে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে যেগুলি মান্য ভাষায় রচিত। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছু প্রবাদ আঞ্চলিক সাহিত্যে ক্রমানুসারে স্থান পেলেও গবেষণামূলক সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষার উপর আলোকপাত ঘটেনি। যদিও বাঁকুড়া জেলার সমগ্র প্রবাদগুলির সংগ্রহ এখনও বাকি আছে। যেগুলি যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে সেগুলি কোনো আঞ্চলিক সাহিত্যেও স্থান পায়নি। অথচ প্রবাদগুলি জেলার প্রাচীন ঐতিহ্য। আজও গ্রামের প্রান্তিক

অঞ্চলে মানুষের মুখে আচার-ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনের নিজস্ব সংস্কৃতি ও উচ্চারণ ভঙ্গি সজীব হয়ে আছে।

বাঁকুড়া জেলার লোক মুখে উচ্চারিত প্রবাদগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা শব্দভাণ্ডার ও সমাজ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি দান করে চলেছে আজ পর্যন্ত। তার ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে একটা গোটা সমাজ ধরা পড়ে। অতীত কালের সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার কথা ফুটে উঠেছে। অতীতে সমগ্র পরিবার একসাথে সুখ-শান্তিতে এক ছাদের তলায় নিশ্চিন্তে থাকত। পুঁথিগত শিক্ষা না পেলেও প্রকৃত শিক্ষার অভাব ছিল না। পরিবারে বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ-ভালবাসার ত্রুটি ছিল না। বিভিন্ন বনৌষধির কথা, আয়ুর্বেদিক চর্চা, জ্যোতিষচর্চা (গ্রহণ নক্ষত্র), আবহাওয়া, জলবায়ু, মৃত্তিকা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট মৌলিক ধারণা গড়ে ওঠে। তা তাদের কথা বার্তায় স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। সেইসব মানুষগুলির সাথে সাক্ষাত্‌কারে বর্তমান সমাজ ও ভাষার অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ছবিটি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। প্রত্যক্ষ প্রশ্নের টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যথা-বেদনা, বঞ্চিত-পীড়িত, মানসিক নির্যাতিত মানুষগুলির বেঁচে থাকার সংগ্রামী মনোভাবটি ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ কথোপকথনে অতীত ও বর্তমানের রূপটি তাদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে

১. তোমরা আর বাঁকুড়ার ভাষা বল না কেন? নাকি শুনতে চায় না ?

"বয়ের সাথে বল্লে ঘর্‍্যে দু-এ্যকট্যা কথ্যা বেরি যায়। ত্যাখন আর ভেবে চিন্তে কথ্যা বলি নাই...... ভদ্র ভাষায় বললে ভেবে চিন্তে বলত্যে হব্যেক।" (অনুপ ঘোষ, বয়স-৪৫, স্বাক্ষর, ভড়া, বিষ্ণুপুর)

২. এখন আর প্রবাদ বলা হয় না কেন ?

"উগুল্যা আগ্যেকার দিন্যের লকের ভাঁষ্যা। এ্যখন ত আর এ সব ভাঁষ্যা বলা হয় নাই।" যদিও প্রবাদগুলোই এই ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছে। প্রবাদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি ওতঃপ্রতভাবে জড়িত। এই আঞ্চলিক ভাষাকে পরিশ্রুত করে যদি উচ্চারণ করে থাকি তবে সেই অঞ্চলের ভাষা-সমাজ, এমনকি মানুষটিকে শনাক্তকরণ (বয়স, জাতি, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থ, সামাজিক, আঞ্চলিক ভেদাভেদ) করতে পারা যাবে না। যেহেতু কলকাতা বা অনান্য শহরাঞ্চলের মানুষেরা পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। সেহেতু আঞ্চলিক ভাষা বা আঞ্চলিক প্রবাদগুলি মান্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে হেয় বা তুচ্ছ। সে কথা প্রত্যক্ষ কথোপকথনে

তাদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। "কইলকাত্যায় য্যখন বলব্য ত্যাখন ব্যঙ্গক্তি হব্যেক ... ওদের ভাষায় কথ্যা বলত্যে হব্যেক। .... শিক্ষিত সমাজ য্যামন কথ্যা বলচ্যে ওদের মত হয়ে আমাদেরক্যে চলত্যে হচ্চ্যে।" (শান্তি ভট্টাচার্য, বয়স-৮০, স্বাক্ষর, ভড়া, বিষ্ণুপুর)

৩. তবে কি প্রবাদ গুলো সব উঠে গেল ?

"না না এ্যখনই উঠ্যে গেছ্যে সব... ও গুল্যা আর বল্যা হই নাই " (বরুণ চক্রবর্তী, বয়স-৪৭, স্বাক্ষর, ভড়া, বিষ্ণুপুর। শান্তি ভট্টাচার্য, বয়স-৮০, স্বাক্ষর, ভড়া, বিষ্ণুপুর।)

অথচ অতীতে সহজ-সরল গ্রাম্য পরিবেশে প্রবাদগুলো অবলীলায় আলোচনা করত কিন্তু এখন তা শূন্যগর্ভ হতে চলেছে। গ্রাম্য পরিবেশেও কংক্রীট সভ্যতার পত্তন হচ্ছে। শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি আজ প্রায় লুপ্ত। ভবিষ্যতেও আর থাকবে না।বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত ধনী মানুষেরা অবহেলা করে চলেছে দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলির প্রতি। ক্ষমতার আগ্রাসনে মেতে উঠেছে ধনী বিত্তশালী মানুষেরা। একদিকে তারা দরিদ্র মানুষগুলিকে কোণঠাসা করেছে অপরদিকে তারা দরিদ্র মানুষগুলির প্রতি শোষণ চালাচ্ছে। দরিদ্র মানুষগুলি আজ হতদরিদ্র, ক্ষুধার্ত, পীড়িত শারীরিক অত্যাচারে মানসিক নির্যাতনে। বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় শহরাঞ্চলের সাথে গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বৈষম্যটি। ফলে দিকভ্রষ্ট গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলিও আজ শহুরে আদব-কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি ছুটে চলেছে তারাও মেতে উঠেছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে। আজ বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি নাভিঃশ্বাস হয়ে উঠেছে। অপর একটি প্রবাদের উদাসীনতার মূল কারণ, বর্তমান যুগের শিক্ষা-দীক্ষা এবং নগরায়ণের প্রভাব। "বিশ্বায়নের খোলা হাওয়ায় নগর সভ্যতার ঢেউ যেভাবে আছড়ে পড়ছে তাতে একদিন অজ-পাঁড়াগাঁয়ের এইসব প্রবাদ হারিয়ে যাবে। এগুলি এলাকার নিজস্ব সংস্কৃতি ও লোকভাষা। এগুলি আমাদের ঐতিহ্য।"[১]বর্তমান বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী মনোভাবের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে ভাষা – আঞ্চলিক উপভাষা। ভাষা বিপন্নতার মূল কারণ বিশ্বায়ন। গ্রামে বা গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে ঢুকে পড়েছে শহুরে প্রভাব। গ্রামীণ মানুষের জীবন যাত্রার পট পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি। সহজ সরল গ্রাম্য ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিপন্ন হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে মহাসংকটের মুখে। এই বিশ্বায়নের মূল কারণগুলি হল–

১. আরবানাইজেসন বা নগরায়ণ

২. কনজুমারিজম বা পণ্য ভোগতন্ত্র

৩. ক্যারিয়ারিজম বা আত্ম উন্নয়ন সর্বস্বতা

৪. ইনফোটেকের বা তথ্যপ্রযুক্তির সর্বগ্রাসীতা।

প্রাচীনকালে গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে মানুষেরা বসবাস করত। তারা একত্রে চিন্তা ও কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সহজ-সরল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করত। তাদের জীবন-যাত্রা, চিন্তা-ভাবনা ছিল মাটির শিকড়ের সাথে জড়িত। বিশ্বায়নের প্রভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণে জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন হচ্ছে। শিখরের সর্বচ্চ স্থানে পৌঁছানোর তাগিদেমানুষ ইঁন্দুর দৌড়ের মতো ছুটে চলেছে। গ্রামে-গঞ্জে মানুষের সংস্কৃতি বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে ভাষা। গ্রাম-গঞ্জে নগরায়নের ফলে বিলাসব্যসন, ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। গ্রামীণ কুটির শিল্পগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রাস করে ফেলেছে। আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব এর প্রবণতা বাড়ছে। গ্লোবালাইজেসনের পতাকা আজ গ্রামের প্রান্তিক জায়গাতেও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামে গণমাধ্যমের প্রভাব (টিভি, রেডিও, সিনেমা) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজ সমস্ত দুনিয়া তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। লোক সংস্কৃতির বিপন্নতার সঙ্গে বাঁকুড়ার সংস্কৃতির আঙ্গিকও পরির্বতন হচ্ছে। (প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র, 'বারো মাসে তেরো পার্বন'-এ) গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে বৈদুতিক আলো প্রবেশ করছে, অ্যানড্রয়েড ফোনের ব্যবহার বাড়ছে, সিনেমা, থিয়েটার, মাইক, ডিস্ক ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, শহুরে সংস্কৃতির আদব-কায়দা আয়ত্ত করছে। বর্তমানে গ্রাম্য অশিক্ষিত নিচু তলার মানুষগুলি শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, গ্রাম থেকে শহর গড়ে উঠছে, বাড়ছে দেশ-দেশান্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থা। বর্তমানে শিক্ষিত এবং তরুণ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা গ্রাম্য প্রবাদগুলি উচ্চারণে অনীহা দেখাচ্ছে। ফলে নীরবে মৃত্যু ঘটে চলেছে প্রবাদের। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাঁকুড়া শহরের সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষার ধ্বংস হচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের গ্রাম্য ভাষা-সংস্কৃতিগুলিও আর চর্চিত হবে না।

বর্তমান কংক্রীট সভ্যতার যুগে প্রবাদের সাহিত্যমূল্য অনেক পরিমাণে কমে গেছে। বর্তমানে উৎকৃষ্ট লেখনী শক্তির উদ্ভাবনের ফলে বাস্তব সমাজ জীবনের সহজ সরল অভিব্যক্তিগুলি ক্রমশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আদর্শ রুচির পরিবর্তনের ফলে প্রবাদগুলি প্রকৃষ্ট ব্যক্তির মুখে আর উচ্চারিত হয় না। সংস্কৃতি, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কার, ভাষা সবকিছু লুপ্ত হয়ে গেলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা অজানা থেকে যাবে। তা পরবর্তী প্রজন্মে চর্চা না থাকার ফলে অবলুপ্তি অবধারিত। বাঁকুড়ার প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি ভাষাকে জানতে কল্পনা নির্ভর হতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। আধুনিক নগরায়ণ সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে গ্রাম্য নিজস্ব শব্দের প্রাচীন দলিলগুলি ক্রমশ বিলিয়মান হতে চলেছে।

গ্রামের কুলবধূদের মুখে বা প্রবীণদের মুখে মেঠো প্রবাদগুলি আর উচ্চারিত হবে না। প্রবীণ মানুষগুলির সাথে সাথে পুরানো প্রবাদগুলি লুপ্ত হবে।

বস্তুতঃ হাঁড়ি, বাউরি, বাগ্দী, ডোম, শুঁড়ি, কেউড়া প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরাই হাসি-কান্না-রাগ-অভিমানের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করেছে প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে রচনা করেছে। এইসব দরিদ্র, নিরক্ষর, নিচু শ্রেণীর মানুষেরাই বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষাকে। গ্রামে গঞ্জে সোঁদা মাটির গন্ধে ভাদু, টুসু, বোলান, ঝাপান, ঝুমুর গান আর শোনা যায় না। গ্রামের সোঁদা মাটির গন্ধ আজ বিলুপ্তির পথে। শহুরে প্রভাব, শহুরে রুচি আদব কায়দায় তারা গ্রাম্য ভাষাকে অবহেলা করছে। গ্রাম্য সংস্কৃতিকে অবহেলা করছে। সহজ-সরল অনাড়ম্ব শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা ত্যাগ করে শহুরে জটিল আড়ম্বর পূর্ণ জীবনে মেতেছে। কংক্রীট সভ্যতার প্রভাব গ্রামের মানুষই সাদরে আপ্যায়ণ করছে। গ্লোবালাইজেসনের যুগে বেশির ভাগ গ্রাম্য মানুষেরাই কবর খুঁড়ছে তাদের নিজের হাতে। আগামী দিনে এই সমস্ত সংস্কৃতি এবং ভাষাকে খুঁজতে হবে ইতিহাসের পাতায়, সাহিত্য বা ভাষাবিজ্ঞানের পাতায়। তখন গবেষণাগার বা গ্রন্থাগারে তথ্যগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লহ, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমন অনেক মহৎ জনের সহায়তায় প্রবাদ সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রাম্য প্রবাদগুলিকে পুনরায় সংগ্রহ করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আগ্রহী করে তুলতে হবে। বিশেষ করে বাঁকুড়ার গ্রাম্য বধূ বা বরিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে এখনও প্রবাদগুলি যত্রতত্র স্ফুরিত হয়। গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে এখানো কথায়, ছন্দের তালে দিদিমা, ঠাকুমা, ঠাকুরদার মুখে শোনা যায়। কখনোওবা ব্যঙ্গের স্বরে, নির্যাতিতা গ্রাম্য বধূর মুখে প্রতিবাদী স্বরে প্রবাদগুলি ফুটে ওঠে। এমন সমস্ত প্রবাদ আছে যেগুলি গ্রাম্য মানুষের সাথে সাথে অবক্ষয় হবে। বর্তমানে লোকসংস্কৃতিবিদ জলধর হালদার, ড. নমিতা মন্ডল, শৈলেন দাস, প্রমুখ মহৎ ব্যক্তিরা প্রবাদগুলি অনেকাংশ সংগ্রহ করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রবাদ সংগ্রহ এখনো অনেক বাকি। শুধুমাত্র প্রবাদ নিয়ে বিস্তারিত কোন সুস্পষ্ট কাজ শুরু হয়নি, প্রবাদের ভাষাতাত্ত্বিক দিক বা সমাজতাত্ত্বিক দিকগুলির প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোকপাত ঘটেনি। বর্তমান অনুসন্ধিৎসু গবেষক যদি আগ্রহী হয় তবে বাংলা সাহিত্যের দরবারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে এবং ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে। কারণ, ভাষা ও সংস্কৃতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রবাদ লুপ্ত হলে সমাজের সংস্কৃতি ও ভাষা হারিয়ে যাবে। শূন্যর্গভ ভবিষ্যতের কথা স্মরণে রেখে বলা যায়, অতীতে যা ছিল তা হারিয়েছে

ঠিকই কিন্তু বর্তমানে এখনো অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে যা সজিব ও সক্রিয় হয়ে আছে। সেই সব প্রাচীন মানুষগুলি আজও বেঁচে আছে। যে সমস্ত প্রবাদ লোকমুখে প্রচারিত বা প্রসারিত সেসবগুলি আজও সজীব হয়ে আছে। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যোগ্য তথ্যগুলি আজও বর্তমান। এখন প্রবাদগুলি সংগ্রহ করে তথ্য বিশ্লেষণ করা সহজ সাধ্য হবে। তাই সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা পেতে আগ্রহী গবেষককে এগিয়ে আসতে হবে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে সমাজকে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভাষাকে, বাঁচিয়ে রাখতে হরে প্রবাদকে। বাঁকুড়ার সমাজ ও ভাষাকে প্রবাদের মধ্য দিয়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে টেনে আনতে হবে এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় নিমগ্ন হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যেহেতু ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। সেহেতু লোকসংস্কৃতির সাথে ভাষা-বিজ্ঞান এক নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান। ভাষাবিজ্ঞান বা সমাজভাষাবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র বিভাগের মতো লোকসংস্কৃতি বিভাগ চালু হলে শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি বাড়বে। শিক্ষার প্রসার বাড়াতে বিভিন্ন অঞ্চলে ফোকলোর একাদেমি গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষার প্রসার বাড়াতে প্রবাদ চর্চা বিভিন্ন দিকের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ফোকলোর একাদেমিগুলিকে সরকারি আওতায় আনতে হবে, জাতীয় ফোকলোর ইনষ্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে। ফোকলোর চর্চার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে তোলা সম্ভব হলেই লোক সংস্কৃতির যাবতীয় দিক বিশেষ করে প্রবাদ নিয়ে দ্রুত হারে কাজ করা সম্ভব হবে। বস্তুতঃ ভাষাবিজ্ঞান বা সমাজভাষাবিজ্ঞানের মতো, ফোকলোর একাদেমি এর ব্যাপকতর চর্চার জন্য বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় গুলির পাঠ্যসূচিতে প্রবাদ বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি স্নাতক বা স্নাতকত্তোর পাঠ্য তালিকায় প্রবাদ চর্চা (প্রবাদ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়) করা যায়, তবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেবে। তাছাড়া গ্রন্থাগারে প্রবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা মূলক পুস্তক থাকলেও প্রবাদ চর্চায় আগ্রহী হবে পাঠকেরা, আগ্রহী হবে গবেষকেরা। প্রবাদ চর্চার ভাষাবিজ্ঞান বা সমাজভাষাবিজ্ঞান বা লোকসংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক নতুন দিক উন্মোচন ঘটবে।

তথ্যসূত্র :

১. জলধর হালদার সম্পাদিত, ‘প্রত্ন পরিক্রমা : মল্লভূম’, নবম খণ্ড, আগস্ট ২০১৬, মল্লভূম কীর্তিশালা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পাতা-১৩৬।